উপন্যাস থেকে কালজয়ী চলচ্চিত্র

হাঙর নদী গ্রেনেড

*প্রথমে উপন্যাস হিসেবে নন্দিত হয়েছে পরে সেই উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে এমন চলচ্চিত্র নেহায়েত কম নয়। এমন চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি চলচ্চিত্র 'হাঙর নদী গ্রেনেড'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে চলচ্চিত্রগুলো নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে একটা অন্যতম চলচ্চিত্র এটি। রঙবেরঙের এই সংখ্যায় **মৌ সন্ধ্যার** প্রতিবেদনে আমরা জানবো এই চলচ্চিত্রটি নিয়ে।*

মুক্তির আলোয়

হাঙর নদী গ্রেনেড ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। সেলিনা হোসেনের উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড' অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার চাষী নজরুল ইসলাম। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুচরিতা, সোহেল রানা, অরুণা বিশ্বাস, অন্তরা, ইমরান, দোদুল ও আশিক প্রমুখ। চিত্রগ্রাহক ছিলেন জেড এইচ পিন্টু, সম্পাদক সৈয়দ মুরাদ, পরিবেশক চাষী চলচ্চিত্র। ১১৩ মিনিটের চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ২১ নভেম্বর ১৯৯৭। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন শেখ সাদী খান।

কী আছে সিনেমায়

গ্রামের দুরন্ত কিশোরী 'বুড়ি'র অল্প বয়সে বিয়ে হয় তার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী গফুরের সাথে। গফুরের আগের ঘরের দুই সন্তান, সলিম আর কলিম। দুজনকেই বুড়ি ভালোবাসে। তাও সে তার নিজের সন্তান চায়। জন্ম হয় তার নিজের সন্তান রইসের। কিন্তু অনেক সাধনার সন্তান রইস হয় বাক-প্রতিবন্ধী। ইতিমধ্যে গফুর মারা যায়। বড় ছেলে সলিমের বিয়ে হয়। ঘরে আসে নতুন বউ রমিজা। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। সলিম চলে যায় যুদ্ধে। বাড়িতে রেখে যায় কলিমকে মায়ের দেখাশুনার জন্য। পাকিস্তানিদের দোসরদের কাছে এই খবর পেয়ে মেজর কলিমকে ধরে নিয়ে যায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের খবর দেওয়ার জন্য কলিমকে মারধোর করে। এক পর্যায়ে তারা কলিমকে তার মায়ের সামনে গুলি করে হত্যা করে। যুদ্ধ আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। রমিজার বাবা রমিজাকে নিয়ে যায়। গ্রামের রমজান আলীর দুই ছেলে যুদ্ধে গেছে জেনে ক্যাম্পে নিয়ে তাকে নির্যাতন করা হয়। এক রাতে অপারেশন চালিয়ে কোণঠাসা হয়ে দুই যোদ্ধা 'বুড়ি'র বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাদের পিছে ধাওয়া করে পাকিস্তানি বাহিনী তার বাড়িতে পৌঁছে। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় একজন মা, মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচাতে তার নিজের আকাঙ্ক্ষিত সন্তানকে তুলে দেয় পাকবাহিনীর বন্দুকের নলের মুখে।

যাদের অভিনয়ে উজ্জ্বল

এই সিনেমায় 'বুড়ি' চরিত্রে অভিনয় করেছেন নন্দিত অভিনেত্রী সুচরিতা। ড্যাসিং হিরো সোহেল রানা অভিনয় করেছেন গফুর চরিত্রে। বুড়ির স্বামী তিনি। অরুণা বিশ্বাস এই চলচ্চিত্রে একজন বৈষ্ণবী আবার বুড়ির বান্ধবী। অন্তরার চরিত্রের নাম রমিজা। বুড়ির সৎ ছেলে সলিমের স্ত্রীর চরিত্রে পাওয়া যায় তাকে। বিজয় চৌধুরী বুড়ির ছেলে রইস চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলো হলো; রাজিব - রমজান আলী, শওকত আকবর - বুড়ির বাবা, শর্মিলী আহমেদ - বুড়ির মা, মিজু আহমেদ - পাকিস্তানি মেজর, নাসির খান - মনসুর, চাষী নজরুল ইসলাম - রমিজার বাবা। এতে আরও অভিনয় করেছেন ইমরান, দোদুল, আশিক প্রমুখ।

এই চলচ্চিত্রে অভিনয়শিল্পীরা দারুণ অভিনয় করেছেন। যা দাগ কেটেছে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে। হলদি গাঁয়ের দুরন্ত চঞ্চল কিশোরী বুড়ি, কৈশোর থেকে দুই মুক্তিযোদ্ধার মা হয়ে ওঠা পর্যন্ত এবং গ্রামের দুই মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচাতে নিজের প্রতিবন্ধী ছেলেকে বুক পাষাণ করে দেশের জন্য পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেওয়ার দৃশ্য দেখে বার বার কেঁদে উঠেছে দর্শকের মন। বড় হয়ে ওঠা বুড়ি চরিত্রে সুচরিতা প্রতিটি দৃশ্যে নজরকাড়া অভিনয় করেছেন। চঞ্চলমতি গ্রাম্য যুবতী, বয়সে অনেক বড় বিপত্নীক গফুরের দুই সন্তান সলিম আর কলিমের পাড়া বেড়ানোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে মা হয়ে ওঠেন। একসময় নিজের গর্ভযন্ত্রণা পেরিয়ে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী সন্তানের জন্ম দেওয়া। এই সন্তান নিয়ে অভাগিনীর হা-হুতাশ, গফুরের মৃত্যুর পর বৈধব্যবেশ। সুচরিতাকে এতো সুন্দর মানিয়ে যায়, তিনি যে কত দক্ষ শিল্পী, তা প্রমাণ হয়ে যায়।

সিনেমায় আরও দেখা যায়, বৈষ্ণবীর চরিত্রে অরুণা বিশ্বাস, একসময় চরণদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভাব তরঙ্গে ডুবে মানবিক প্রেমের গান, ভক্তির গান গেয়ে বেড়াতেন। অস্থির যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যেও তিনি একতারা বাজিয়ে অখিল বাউলের লেখা দেশের গান গেয়ে বেড়ান। ভিনদেশি পাকিস্তানি সেনারা নয়, তার আখড়া ভেঙে তছনছ করে দিয়ে যায়, চোখের সামনে অখিল বাউলকে গুলি করে হত্যা করে দেশের বেইমান রাজাকাররা। এই নরপিশাচেরা মনে করে, গান গেয়ে বেড়ানো বাউলেরাও দেশের শত্রু। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, গ্রামবাংলার বাউলদের ওপর এই অত্যাচারের ঘটনা আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেও বারবারই ঘটে!

বুড়ির মতো মায়েরা তবু একদিন আকাশটাকে মুক্ত করার, দেশটাকে স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে পেটের নাড়িছেঁড়া ধন ছেলে রইসকে পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিয়েছে। চোখের সামনে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছে। প্রতিবন্ধী রইস চরিত্রে বিজয় চৌধুরীর অভিনয় কখনো ভোলা যাবে না। বুড়ি আসলে বাংলার হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার মা। বুড়ির

পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম
২৩ অক্টোবর ১৯৪১ - ১১ জানুয়ারি ২০১৫

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ২২তম আসরে এই চলচ্চিত্রটির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পান চাষী নজরুল ইসলাম।

১৯৭৫ সালের ১৩ আগস্ট সেলিনা হোসেনকে লেখা এক চিঠিতে সত্যজিৎ রায় উপন্যাসের প্রশংসা করেন এবং চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার আশা পোষণ করেন।

মতো মায়েদের ত্যাগের বিনিময়ে রক্তের নদী পেরিয়ে আজকের স্বাধীনতা। আজকের বাংলা ভাষার দেশ, বাংলাদেশ। রইস প্রবাদের মতো সত্যি, কানা হলেও পদ্মলোচন। রইসের মতো মানুষদের প্রাণের বিনিময়ে বাংলার জলাশয়ে আজও শাপলা ফোটে। সেই শাপলার চোখে চোখ রেখে প্রতিদিন সূর্য ওঠে।

সত্যজিৎ রায়ের চিঠি

ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড' অবলম্বনে কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৩ আগস্ট সেলিনা হোসেনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এ উপন্যাসের প্রশংসা করেন এবং চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার আশা পোষণ করেন। কিন্তু তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার কারণে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা যায়নি। পরে চাষী নজরুল ইসলাম ১৯৯৩ সালে এটি নির্মাণ করেন।

যেভাবে লেখা হয়েছিল উপন্যাস

'হাঙর নদী গ্রেনেড' একটি প্রতীকী নাম। শব্দ তিনটি গভীর অর্থ প্রকাশ করে। একটা জাতিসত্তাকে গিলে খেতে চায় হাঙর মাছ। ফুল, ফসল, বাংলা ভাষা ও নদী বুকে নিয়ে যারা আনন্দে কাটাতে পারে জীবন। তাদের সুখ হারাম করে দিচ্ছে হাঙর। নিজেদের জাতিসত্তাকে ছিনিয়ে আনতে যেমন গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়েছে তেমনি গ্রেনেডে প্রাণও দিতে হয়েছে। রক্ত দিয়ে লিখতে হয়েছে ইতিহাস। ২০১৫ সালে এক গণমাধ্যমে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন লিখেছিলেন, 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক ছিলেন আবদুল হাফিজ। তিনি মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রেসকোর্সে যাওয়ার সময় তিনি আমাদের বাসায় উঠেছিলেন। এক মায়ের গল্প শুনিয়েছিলেন। যশোরের কালীগঞ্জের যে মা দুই মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রতিবন্ধী ছেলেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক হাফিজ এই ঘটনা নিয়ে আমাকে লিখতে বলেন। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, ছোটগল্প লিখব। কিন্তু এই ঘটনার অনুরণন এত গভীর যে পরে লিখে ফেলি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রথম উপন্যাস, হাঙর নদী গ্রেনেড।'

সিনেমায় গ্রাম

ইতিহাসআশ্রিত 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের কাহিনির বুননে গ্রামীণ জীবনযাপন, গরু দিয়ে ধান মাড়াই, পা দিয়ে নেড়ে চেড়ে রোদে ধান শুকানো, ওলানে মুখ রেখে বাছুরের দুগ্ধপান, হাঁস-মুরগি পালন, ডিম তুলে আনা, চাষি গফুরের লাঙল কাঁধে মাঠ থেকে ফেরা, গাছির শরীরে জড়ানো দড়ি, মাটির উনুনে কাঠখড় জ্বালিয়ে রান্না, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চাল গুঁড়া করা, সরল বিশ্বাসী গ্রামের মানুষের বৃক্ষকে সাক্ষী করে মানত, মাজারে ধুলায় গড়াগড়ি খাওয়া, গ্রাম্য বালকের পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান, কুটুমপাখির ডাক অপরূপভাবে ফুটে উঠেছে। এসব দৃশ্য বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ২২তম আসরে এই চলচ্চিত্রটির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পান চাষী নজরুল ইসলাম। আর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার জয় করেছিলেন সুচরিতা। শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হিসেবে পুরস্কার জিতেছিলেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

শেষ কথা

সেলিনা হোসেন এমন একটি বাস্তব উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন এবং চাষী নজরুল ইসলাম চলচ্চিত্রায়িত করতে পেরেছিলেন বলে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো আজও আমাদের চোখের সামনে ভাসে। আমাদের শোকে ভাসায়। অন্যদিকে উপন্যাসের পুরো কাহিনি রিলের মধ্যে তুলে ধরতে পেরেছেন চাষী নজরুল। সাহিত্যনির্ভর সুন্দর চলচ্চিত্র নির্মাণে সৃজনশীলতা ও দক্ষতায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে উপন্যাস থেকে নির্মিত কালজয়ী চলচ্চিত্র 'হাঙর নদী গ্রেনেড'। এখনো যারা চলচ্চিত্রটি দেখেননি দেখে নিতে পারেন। ঘরে বসে ইউটিউব থেকেই উপভোগ করতে পারবেন সিনেমাটি।